ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বর্ধমান জেলা এবং মুসলিম সমাজ

সামীম রহমান মোল্লা

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, কবি জগদ্রাম রায় গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, মেজিয়া, বাঁকুড়া-722143, পশ্চিমবঙ্গ। samim.jyoti@gmail.com, Mob-9851109446.

Abstract

আইন অমান্য আন্দোলনের পরবর্তীতে ভারতের ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম আন্দোলন হল ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বর্ধমান জেলার বাসিন্দারাও এই উত্তাল আন্দোলন সামিল হয়। ৯ই আগষ্ট গান্ধীজী আগষ্ট আন্দোলনের ডাক দেন আর ১৭ই আগষ্ট বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল কোর্ট প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। সর্বত্র পিকেটিং শুরু হয়ে যায়। পুলিশ প্রচণ্ডভাবে মিছিলের ওপর লাঠি চার্জ করে। চারিদিকে ইলেকট্রিক ও টেলিফোনের তার কেটে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা হয়। রেললাইন তুলে দেওয়া হয়, থানা, পোস্ট অফিস, রেল স্টেশন পোড়ানো শুরু হয়ে যায়। জামালপুর, খণ্ডঘোষ, সাদিপুর, বেড়ুগ্রামের পোস্ট অফিসে আগুন লাগানো হয়। খানা জংশন থেকে গলসী ও খানা জংশন থেকে ভেদিয়া পর্যন্ত রেললাইন তুলে দিয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ করা হয়, আন্দোলনরত কর্মীরা জামালপুর স্টেশনে কর্তব্যরত এক পুলিশ কর্মীর কাছ থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছিল। বর্ধমান কোর্ট প্রাঙ্গণে ইংরেজদের জাতীয় পতাকা নামিয়ে আমাদের দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগদানকারী কয়েকজন উল্লেখযোগ্য মুসলিম নেতারা হলেন সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহ, আবুল হাশিম, মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, আব্দুস সাত্তার, মোল্লা জাহেদ আলি, মহম্মদ ইয়াসিন, গোলাম মহবুল, আবুল আহাদ, আব্দুল মকির, আব্দুল সামি, কওসর প্রমুখ। মুসলিম লীগের কিছু নেতা অবশ্য উগ্রপন্থী ছিলেন কিন্তু তাঁদের সংখ্যা জেলায় খুবই কম। প্রভাবও বিশেষ ছিল না। কারণ আবুল হাশিমের মত মুসলিম লীগের নেতার কখনই বিচ্ছিন্নতাবাদী রজনীতিকে প্রশয় দেন নি। ইতিপূর্বে ১৯৩৬ সালে পিতা আবুল কাশেম মারা গেলে বর্ধমানের বর্ধমানের সংরক্ষিত আসনে আবুল হাশিম নির্দল প্রার্থী রূপে কংগ্রেস প্রার্থী বর্ধমান জেলার তদানীন্তন কংগ্রেস দলের প্রভাবশালী নেতা মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিনকে ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন।

সূচক শব্দঃ বর্ধমান, মুসলিম, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলন ইত্যাদি।

আইন অমান্য আন্দোলনের পরবর্তীতে ভারতের ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম আন্দোলন হল ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন। ১৯৩৯ এর সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার ভারতের সহযোগিতা চায়। কংগ্রেস শর্ত হিসেবে যুদ্ধচলাকালীন একটি অস্থায়ী সরকার ও যুদ্ধ শেষে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে। ভারত সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় কংগ্রেসের মধ্যে এক সংকট দেখা দেয়।[1] কিন্তু 'আগষ্ট প্রস্তাব' ঘোষণার দ্বারা সরকার জানায় যুদ্ধের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে শাসনতান্ত্রিক কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়, যুদ্ধ শেষে এক প্রতিনিধিসভার ওপর সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু ১৯৪১ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়

জাপানের সাফল্য ও রেঙ্গুন পর্যন্ত অগ্রগতি ব্রিটিশ সরকারকে শঙ্কিত করে তোলে। ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সরকার স্যার স্ট্র্যাফোর্ড ক্রীপসকে দৌত্যে পাঠায়। ক্রীপস প্রস্তাবে ভারতকে Dominion Status দানেব প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া পূর্ণ স্বাধীনতা দানের বা পাকিস্তান সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না থাকায় কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এই সব কারণে গান্ধীজী ব্যঙ্গ করে ক্রীপস প্রস্তাবকে 'A post dated cheque on a crushing Bank' বলে প্রত্যাখ্যান করেন ও ইংরেজকে ভারত ছাড়ার পরামর্শ দেন।[2] এরপর তিনি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেন; ওয়ার্কিং কমিটি এই প্রস্তাব সমর্থন করে। বিখ্যাত ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী, নেহরু ও অন্যান্য নেতারা গ্রেপ্তার হন। নেতৃত্ববিহীন ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সারা ভারত উত্তাল হয়ে ওঠে।

বর্ধমানও এই উত্তাল আন্দোলনের সামিল হয়। ৯ই আগষ্ট গান্ধীজী আগষ্ট আন্দোলনের ডাক দেন আর ১৭ই আগষ্ট বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল কোর্ট প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। সর্বত্র পিকেটিং শুরু হয়ে যায়। পুলিশ প্রচণ্ডভাবে মিছিলের ওপর লাঠি চার্জ করে। সমস্ত নেতার মুক্তির দাবীতে ১৩ই সেপ্টেম্বর সারা জেলায় হরতাল পালিত হয়। নেতৃত্ববিহীন আন্দোলন আর অহিংস রইলো না। চারিদিকে ইলেকট্রিক ও টেলিফোনের তার কেটে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা হয়। রেললাইন তুলে দেওয়া হয়, থানা, পোস্ট অফিস, রেল স্টেশন পোড়ানো শুরু হয়ে যায়। জামালপুর, খণ্ডঘোষ, সাদিপুর, বেড়ুগ্রামের পোস্ট অফিসে আগুন লাগানো হয়। খানা জংশন থেকে গলসী ও খানা জংশন থেকে ভেদিয়া পর্যন্ত রেললাইন তুলে দিয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ করা হয়, আন্দোলনরত কর্মীরা জামালপুর স্টেশনে কর্তব্যরত এক পুলিশ কর্মীর কাছ থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছিল।[3] বর্ধমান কোর্ট প্রাঙ্গণে ইংরেজদের জাতীয় পতাকা নামিয়ে আমাদের দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।[4] ছাত্রজীবন শেষ করে মণ্ডলগ্রামের তরুণ নেতা নারায়ণ চৌধুরী স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিপ্লবী উকিল বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রতিদিন ১০ টা না বাজতে বাজতেই শ্যামসায়রের পাড়ে দাঁড়িয়ে তাঁব জ্বালাময়ী বক্তৃতা আরম্ভ করতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রনেতা সনৎ গাঙ্গুলী, বলাই রায়, প্রশান্ত গাঙ্গুলী কলেজ থেকে ছেলেদের একত্রিত করে (অন্যান্য স্কুল থেকেও ছেলে বার করে) বিরাট মিছিল নিয়ে নেতৃবর্গ শহর পরিক্রমা করে কোর্ট প্রাঙ্গণে হাজির হতো। সেখানে নেতারা আন্দোলনের স্বপক্ষে জোরালো বক্তৃতা দিতেন, তারপর সবাই যে যার বাড়ী ফিরে যেতেন।[5] বিজয় ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রামে গ্রামে ঘুরে আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমত জাগ্রত করেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগদানকারী কয়েকজন উল্লেখযোগ্য মুসলিম নেতারা হলেন সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহ, আবুল হাশিম, মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, আব্দুস সাত্তার, মোল্লা জাহেদ আলি, মহম্মদ ইয়াসিন, গোলাম মহবুল, আবুল আহাদ, আব্দুল মকির, আব্দুল সামি, কওসর প্রমুখ। আন্দোলন যখন জোর কদমে চলছে তখন পুলিশ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ দাস হাজরা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ভরত গাঙ্গুলী, অসীম ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে। অনেকের মতে দাশরথি তা-এর নেতৃত্বে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে মেদিনীপুরের মত জাতীয় সরকার গঠন করা হয়।[6] দাশরথি স্মরণ-সংখ্যা ত্রৈমাসিক লোকভারতী পত্রিকার মাঘ-চৈত্র ১৩৫৭ সংখ্যায় দাশরথি বাবুর ভাই দুর্গেশ তা যে প্রতিবেদন লিখেছেন তাতেও এই জাতীয় সরকার-এর কোন উল্লেখ নাই। তবে দাশরথিবাবু যে অভিনব ভূমিকা নিয়ে আন্দোলনকে ঐ অঞ্চলে ব্যাপকতর করে তুলেছিলেন তার পরিচয় দুর্গেশ তা-র প্রতিবেদনে পাওয়া যায়। 'বিয়াল্লিশের বিপ্লবে দাদার(দাশরথি তা) ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেখানে রণকৌশল ছিল ভিন্ন। শক্তিগড় স্টেশনে বহু হিন্দুস্তানীর নামে বস্তা বস্তা পার্শেল আসত। সেগুলি জমা হত

শশিভূষণ দাঁ (ওরফে বাদল দাঁ)-এর কাছে। তারপর বড়শুল ও শক্তিগড় মোড়ে আনগুনো গ্রামের গুরুপদ প্রামাণিকের মিষ্টান্নের দোকানে সেগুলি জমা হত। গভীর রাত্রে তিনকড়ি সর্দার (চৌকিদার) তার গাড়ীতে করে প্রসাদ সামন্ত, দুর্গা গুহ, দুর্গেশ তা মালগুলি নদী পার করে শিয়ালী গ্রামে সুরেনের বাড়ীতে রেখে আসত। পরে ঐ সব জিনিস দাশরথি তা'র নির্দেশে কর্মী সংগ্রহ করে বিভিন্ন অঞ্চলে বিলি করা হতো। তাদের প্রত্যেকের ছদ্মনাম ও নম্বর দেওয়া থাকতো। অনুরূপ নম্বর দেখলেই জিনিসপত্রের ব্যবস্থা হত। তারপর চলত নির্দেশ অনুযায়ী অ্যাকশন। বলা বাহুল্য বস্তুগুলি ছিল বোমা ও অগ্নিসংযোগের মালপত্র। ডাকঘর, গাঁজা আফিমের এবং মদের দোকান ও বিলাতী কাপড় পোড়াবার নির্দেশ থাকত।'[7] এই প্রতিবেদন থেকে দাশরথি তা-র বিপ্লবী কার্যের একটা আভাস পাওয়া যাবে। কালনায় ৪২-এর আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের কংগ্রেসকর্মী গুপ্ত বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগ দিয়ে এক যোগে পোস্ট অফিস, স্টেশন, আদালত ভবন প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে আগুন লাগাতে শুরু করে। পুলিশ ও সরকারী প্রশাসন নির্মমভাবে আন্দোলনকারীদের ওপর অত্যাচার চালাতে থাকে ও এইভাবে আন্দোলন দমন করে। সরকারী সম্পত্তি ক্ষতি করার অপরাধে গোপেন কুণ্ডু, অন্নদা মণ্ডল, শিবপ্রসাদ পাণ্ডে, বিশ্বনাথ সাহা, সিদ্ধেশ্বর দাস, কানাই দে প্রমুখ ১৪ জন যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে বর্ধমানে চালান দেয়।[8] এর পরেও সরকারী সম্পত্তি ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সরকার শহরের বাসিন্দাদের ওপর ৩৫০০০ টাকা পিটুনিকর জরিমানা ধার্য করে ও নির্মমভাবে এ টাকা আদায় করে।[9]

ইতিমধ্যে ১৯৩৮-৪০ সালে কালনায় আবদুস সাত্তার, পূর্বস্থলীতে বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, মন্তেশ্বরে গোপেন কুণ্ডু, নারায়ণ চৌধুরী ও আবদুর রহমানের নেতৃত্বে কংগ্রেসের সংগঠন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের মহিলা, কৃষক ও শ্রমিক শাখাগুলিও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলে। কালনা মহকুমায় গান্ধীবাদী কংগ্রেসের প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন অন্নদা প্রসাদ মণ্ডল, আব্দুস সাত্তার, নারায়ন চৌধুরী, আব্দুর রহমান প্রমুখ। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে অন্নদা প্রসাদ মণ্ডল ও আব্দুস সাত্তার এর পূর্বেই গেপ্তার বরণ করেছিলেন। নিরাপত্তা আইনে আব্দুস সাত্তারের কারাবাসের মেয়াদ আরও বাড়ানো হয়।[10] কালনার সুচরিতা পাল ও পূর্বস্থলীর রমাদেবীর নেতৃত্বে মহিলা সংগঠন শক্তিশালী হয়। আগস্ট আন্দোলনের আহ্বানে কালনা মহকুমায় ১৩-১৮ আগষ্ট এবং ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর হরতাল পালিত হয়।[11] কালনা শহরে সংঘটিত আন্দোলনের তীব্রতা সমগ্র জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। টাউন হলে ১৩ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৪টায় প্রতিবাদ সভায় অনেক লোকের সমাগম হয়। প্রথমে গুঞ্জন, তারপর চিৎকার, শেষে হৈ হৈ করে জনতা ছুটল জেলখানার দিকে সেখানে অন্নদা বাবুকে আটকে রাখা হয়েছিল। প্রায় ৩-৪ হাজার উদ্দাম জনতা মুখে বন্দেমাতরম ও ইংরেজ ভারত ছাড়ো রব করতে করতে কালনা সদর জেলে হাজির হলো। লোহার গেট ভাঙতে চেষ্টা হল। জেলের পাগলা ঘন্টা বাজতে লাগল। ফারারিং আরম্ভ হলো। জনতা তখন কোর্ট প্রাঙ্গণে বেঞ্চ কোর্টের খড়ের চালে আগুন ধরালো। তারপর জনতা চলল কালনা স্টেশনের দিকে। সেখানে স্টেশন পোড়ানো হল, তারপর জনতা ফিরল পোস্ট অফিসের দিকে। পোষ্ট অফিসও পুড়ল।[12] কালনা কোর্টের উপর ত্রিবর্ণ রঞ্জিত স্বাধীনতা পতাকা তোলেন পূর্বস্থলীর নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।[13]

কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভোগ ছাড়াও ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধিতা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল। রমাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর 'বর্ধমান জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন 'প্রধানত তাত্ত্বিক কারণে তাঁরা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নাই।' বোম্বাইতে ১৯৪৩-এর ২৩শে মে সি.পি.আই.-এর প্রথম কংগ্রেসে বোসের দল (সুভাষ বোস) ফরওয়ার্ড ব্লককে বিশ্বাসঘাতক বলে প্রস্তাব

নেওয়া হয়। এদের পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্রোধ, প্রধানত পড়েছিল সুভাষ ও জয়প্রকাশ নারায়ণের ওপর। গান্ধীজীও বাদ যান নাই। ১৯৪২-এর আগেই তাঁকে 'The leader of the bourgeoise' বলা হয়েছে, তাঁর non-cooperation নীতিকে দেউলিয়া ও non-violent suicide বলা হয়েছে। দ্য পিপলস ওয়ার পত্রিকার ১৯৪২-এর ১১ই অক্টোবরের সংখ্যায় বলা হয়-নাশক ও সত্যাগ্রহীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই-'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'-দেউলিয়া নীতি। পাকিস্তান দাবী সমর্থন করে কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সরকারের হাতই শক্ত করে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে, 'কমিউনিস্টরা '৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগও দেয় নাই, মদতও দেয় নাই।'

কমরেড নাম্বুদ্রিপাদ-এর 'স্বাধীনতা ও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি' পুস্তিকায় 'কিছু ভুল ত্রুটি' অধ্যায়েও বলেছেন, 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। আর আমাদের মনে হয়েছিল ব্রিটেনসহ ফ্যাসিবিরোধী বিশ্বশক্তি মানবসভ্যতার জঘন্যতম শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে। এই অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামে বাধা দিলে আমাদের নিজেদেরই মারাত্মক ক্ষতি হবে। তবে এই সঠিক অবস্থান নিয়েও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সমস্ত অংশগ্রহণকারীকে 'ফ্যাসিবাদীদের সহচর' বলে চিহ্নিত করা গুরুতর ভুল হয়েছিল। ফলে সাময়িকভাবে তাঁরা ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।'[14]

কম্যুনিস্ট পার্টি ৪২-এর আন্দোলনে যোগ না দিয়ে ঠিক করেছিল, কি ভুল করেছিল এই সব তাত্ত্বিক প্রশ্নে না গিয়ে কম্যুনিস্ট, লীগ ও অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দল যদি যৌথভাবে মিলিত হয়ে গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দিত তাহলে আন্দোলন খুবই শক্তিশালী হতো ও সারা দেশ জুড়ে বিপ্লবের আগুন জ্বলতো। ফলে ব্রিটিশের ভারত তাগ হয়ত ত্বরান্বিত হতো। তার পর প্রতিটি পার্টি তাদের আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী ঘর গোছাতে পারতো। হিন্দু মহাসভা ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে Working Committee-তে মন্তব্য করেছেন-'The Peril confronting India, demands the mobilisation of India's tremendious manpower...which can never be secured without a National Govt.' (Nalanda year book 1947-48 p. 242).

১৯৪০ সালে বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের নির্বাচন হয়। এই সময় কংগ্রেসের একটা গোষ্ঠী ন্যাশান্যাল ফ্রন্ট গঠন করে। এই ফ্রন্ট বামপন্থীদের নিয়ে গঠিত হয়। এরাই কংগ্রেসের ভিতর থেকে কম্যুনিস্ট আদর্শ গোপনে প্রচার করতে থাকে ও কংগ্রেস কমিটি দখল করার চেষ্টা করে। তারই ফলে জেলা কংগ্রেসের কর্তৃত্ব সাময়িকভাবে বামপন্থীদের দখলে চলে যায়। এই নির্বাচনে ফকির রায় সভাপতি ও শিবশঙ্কর চৌধুরী সম্পাদক হন। কিছুদিনের ব্যবধানে আবার জেলা কংগ্রেসের ভার যাদব পাঁজা ও বিজয় ভট্টাচার্য এই দক্ষিণ পন্থীদের হাতে ন্যস্ত হয়। এই সময় জেলা কংগ্রেস কমিটি নতুন করে গঠিত হলে কমিউনিস্টরা কংগ্রেস ত্যাগ করে। এখানকার নির্বাচনে যাদব পাঁজা সভাপতি ও আবদুস সাত্তার সম্পাদক হন। বিনয় চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সরোজ মুখোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর চৌধুরী প্রমুখ বামপন্থী নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

এই সময়ে ১৯৪৩ সালে জেলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখা দেয়। জেলায় ও মহকুমাগুলিতে দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার জন্য ফুড কমিটি গঠিত হয়। বর্ধমানে যে ফুড কমিটি গঠিত হয় তার সম্পাদক ছিলেন ভুজঙ্গ সেন।[15] সদর মহকুমার ফুড় কমিটির সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ শাহেদুল্লাহ। নাদনঘাটে কালনা মহকুমার খাদ্য সম্মেলন হয়। এর সংগঠক ছিলেন হরগোবিন্দ রেজ। কুসুমগ্রামের আবদুল হাসানাৎ, কাটোয়ায় করোজ গ্রামে মুশা মিঞার উদ্যোগে খাদ্য সম্মেলন হয়। কিন্তু খাদ্য সম্মেলন বা ফুড কমিটি করে যে সুরাহা হয়েছিল তা বলা যায় না। গ্রামে গ্রামে

খাদ্যের জন্য হাহাকার। আগের বছর থেকে ভাল ফসল হয় নাই। ১৯৪৩ সালে যে ধান হয় সব পোকায় নষ্ট করে। যে সামান্য পাওয়া যায় তার স্বাদও তিক্ত। ১৯৪১ সালে বৈশাখ মাসে ধান বিক্রয় হয়েছিল দু টাকা নয় আনায় এক বস্তা (দেড় মন)। আষাঢ় মাস থেকে ধানের দর হু হু করে বাড়তে থাকে। কুড়ি টাকা বস্তা দাঁড়ায়। তাও যে ধান মজুত থাকে মিলিটারীর জন্য সরকার উচ্চ দর দিয়ে কিনে নেয়। আরও দর বাড়ার আশায় ব্যবসাদাররা মজুত করতে থাকে। কালো বাজারীর সৃষ্টি হয়। গ্রামে ওল কচু গাছ সব নির্মূল হয়ে যায়। এই খেয়েই লোকে কোন মতে বেঁচে থাকার প্রয়াস পায়।[16] দলে দলে লোক গ্রাম ছেড়ে শহরে এক মুঠো ভাতের আশায় ভিড় করতে থাকে; শেষে ভাত তো দূরের কথা, এক ভাঁড় ফেনের জন্য দরজায় দরজায় ধর্ণা দেয়। কোন উৎসবের বাড়ী থেকে ফেলে দেওয়ায় উচ্ছিষ্ট ঘেঁটে লোকে পেট ভরাবার চেষ্টা করে। বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটকে এর মর্মান্তিক বর্ণনায় বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। আটা ও চিনি অমিল, দোকানে দোকানে গুড়ের চা, আটার বদলে বিড়ি কলাই ও ভুট্টার মিশ্রণ । অথচ যাদের পয়সা ছিল তাদের কোন অভাব ছিল না। চতুর্গুণ আটগুণ দাম দিলে চোরা বাজারে অঢেল মাল।

এর ওপর ১৯৪৩ সালের দামোদরের বিধ্বংসী বন্যায় শক্তিগড়ের কাছে রেললাইন ও জি. টি. রোড ভেঙে যায়।[17] দামোদরের প্রবাহ বাঁকা ধরে দুই তীরের গ্রাম প্লাবিত করে। শক্তিগড়, বড়শুলের বিস্তীর্ণ এলাকা বানেব জলের বালিতে ভরে যায়, দীর্ঘদিন চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে থাকে। বনাত্রাণে কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস যৌথভাবে ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মন্বন্তরে রিলিফ, মজুতদারি ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে এই যৌথ আন্দোলন জোরদার হয়। দুর্ভিক্ষে ও বন্যায় সাম্যবাদী কর্মীদের অক্লান্ত সেবাব্রত তাঁদের দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। তবে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হওয়ায় বর্ধমান জেলায় ৪২-এব আন্দোলন সুসংগঠিত ভাবে গড়ে ওঠে নাই। বন্যা ও মন্বন্তর এর ত্রাণকার্যের সেবাব্রতের ফলেও '৪২- এর আন্দোলনেও ভাটা পরে।[18] বিচ্ছিন্নভাবে এখানে ওখানে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চলে। সারা ভারতেও নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হওয়ায় তাদের অনুপস্থিতিতে ও যোগ্য সংগঠনের অভাবে সবচেয়ে বড় কথা জাতীয় বিপ্লবের জন্য পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচীর অভাবে আগস্ট আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয। তবে গণআন্দোলন ও সন্ত্রাসের ব্যাপকতা দেখে ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে ভারতে তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। ভারতকে আর বেশী দিন পবাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা যাবে না। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। তবে বর্ধমান জেলায় যে গণচেতনা জাগ্রত হয তার ফলে ১৯৪৭ স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত জেলায় রাজনৈতিক আন্দোলন বিভিন্ন আকারেই চলতেই থাকে।

রমাকান্ত চৌধুরী বর্ধমান জেলায় স্বাধীনতা প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন 'বর্ধমান জেলায় কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে মত বিরোধ প্রবল থাকলেও, দক্ষিণপন্থা ও বামপন্থার বৈপরীত্য থাকলেও, সমস্ত ব্যাপক আন্দোলনেও একটি সময় পর্যন্ত বিভিন্ন নির্বাচনে তাঁরা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এক সঙ্গে লড়াই করেছেন। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই-এর জন্যই বর্ধমান জেলায় সাম্প্রদায়িকতা কখনই প্রবল হয়ে উঠতে পারে নাই।' সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার ১৯৪২-এর বিভিন্ন সংখ্যায় যে সমস্ত সংবাদ পরিবেশিত হয় তাতেও এই এঁক্যবদ্ধ আন্দোলনের সুর ধ্বনিত হয়।

তবে একথা ঠিক সাম্প্রদায়িকতা প্রবল হয়ে না উঠলেও জেলার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। অবশ্য সমস্ত দলের যৌথ প্রচেষ্টায়, পুলিশী ও সরকারী হস্তক্ষেপে তা খুব ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করতে পারে নাই।

বনপাশ স্টেশনের কাছে বেলগ্রামে (আউসগ্রাম থানা) স্থানীয় মসজিদের সামনের রাস্তা দিয়ে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়েছিল। পুলিশ ও শাহেদুল্লাহ সাহেবের হস্তক্ষেপে তার

একটা সুষ্ঠু সমাধান হয়।[19] ১৯৩৮ সালে সমকালীন লীগ মন্ত্রীসভার মসজিদ, দরগার পাশ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে দেবদেবীর মূর্তি শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করে একটা আইন জারি করলে বর্ধমান শহরে বোরহাটের রাস্তার ধারে ভেরীখানার পাশ দিয়ে দুর্গাপ্রতিমা, কালীপ্রতিমা নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়েছিল। বার এসোসিয়েশন, সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন কয়েকজন নেতা ও পুলিশি প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ও মহামান্য উচ্চ আদালতের রায়ের ফলে দাঙ্গা ঘটতে পারে নাই। খোসবাগানের ফৌজদারী কালীর জলজ্যান্ত উদাহরণের ঘটনা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এছাড়া আলমগঞ্জের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও নেতা রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের জায়গার ওপর রাস্তা দিয়ে মহরমের তাজিয়া নিয়ে যাওয়া যেভাবে বন্ধ করা হয়েছিল তাতে ইসলাম ধর্মে আঘাত দেওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল; কিন্ত তদানীন্তন জেলাশাসকের দ্রুত হস্তক্ষেপে তার একটা মীমাংসা হয়ে মায়। ১৯৪২ সালের মে মাসে জেলার পলাসন, গয়েশপুর, মণ্ডলগ্রাম অঞ্চলে মণ্ডলগ্রামের হাটতলার মেলায় একজন মুসলমান মিষ্টান্ন বিক্রেতার মিষ্টান্ন বিক্রিকে কেন্দ্র করে সমগ্র অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রায় বেঁধে এসেছিল। একটা অগ্নিগর্ভ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, বিজয় ভট্টাচার্য, হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর চৌধুরী (কালো দা), রশিদ সাহেব, হিন্দু মহাসভার শ্রীকুমার মিত্র, মুসলিম লীগের সভাপতি আবুল হাসেম, প্রণবেশ্বর সরকার (টোগো সরকার), মোড়ল গাঁয়ের ময়না চৌধুরী, পুলিশ ইন্সপেক্টার অমরবাবু, ডিএসপি বঙ্কিমবাবু এঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় একটা ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে এ অঞ্চল রক্ষা পায়।[20] ১৯৪২ সালের আন্দোলনের পর ইতিহাসের গতি দ্রুত এগিয়ে চলে। ১৯৪৫-এর মার্চ মাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ভারতের উপকণ্ঠে কোহিমাতে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন, কলকাতার হাতিবাগানে জাপানী বোমা ফেলা, দলে দলে লোকের কলকাতা থেকে পলায়ন, লর্ড ওয়াভেলের সিমলা কনফারেন্স, লর্ড ওয়াভেলের পরিকল্পনা ঘোষণা, ১৯৪৬ সালে ১৮ই ফেব্রুয়ারী নৌবিদ্রোহ -এইসব ঘটনা দ্রুত এগিয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নৌবিদ্রোহে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন মেড়ালের বাদল দত্ত। এই নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি কর্মচ্যুত হন। পরিস্থিতি যখনই খারাপের দিকে গেছে তখনই ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর সঙ্গে একটা মীমাংসার চেষ্টা করেছে। জাপানের আক্রমণে রেঙ্গুনের পতনের অব্যবহিত পরে যেমন ব্রিটিশ সরকার ভারতের নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর একটা মীমাংসায় আসার উদ্দেশ্যে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন তেমনি ১৯৪৬ শ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়াবি নৌ-বিদ্বোহ দেখা দিলে পরদিন অর্থাৎ ১৯শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লীমেন্ট এটলী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পন্থা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ক্যাবিনেট পর্যায়ের তিনজন মন্ত্রীকে প্রেরণ করেন। মহম্মদ আলি জিন্না ও মুসলিম লীগের বিরোধিতায় ক্যাবিনেট মিশনের কাছে কোন ঐক্যবদ্ধ দাবী উপস্থাপিত করা সম্ভব হল না। ক্যাবিনেট মিশন শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় একটা যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা মাফিক তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ক্যাবিনেট মিশনের ঘোষণায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনের পরিকল্পনা কংগ্রেসনীতির বিরোধী হওয়ায় তাঁদেরও মনঃপুত হল না। কংগ্রেস সংবিধান রচনার উদ্দেশে গঠিত গণপরিষদে যোগদানে সম্মতি জ্ঞাপন করে। তবে এ ঘোষণায় পাকিস্তান গঠনের সম্ভাবনায় লীগ উল্লসিত হয়। ওয়াভেলের সরকার গঠনের প্রস্তাবে কংগ্রেস যোগ না দেওয়ায় পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট থেকে পাকিস্তানের জন্য গণ আন্দোলন আরম্ভ হয়। ফলে মুসলীম লীগ আশাহত হয়ে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ডাক দেয় এবং ঐ দিনেই কলকাতায় চরম বিশৃঙ্খলা নেমে আসে।[21]

১৯৪৬ সালে বাংলার আইনসভার নির্বাচন হয়। বর্ধমান জেলার সাধারণ আসন ছিল চার। বর্ধমান সেন্ট্রাল দুই ও বর্ধমান উত্তর-পশ্চিম দুই; মুসলমান-১, জমিদার-১। বর্ধমান সেন্ট্রালে জিতলেন কংগ্রেসের কানাইলাল দাস ও যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, উত্তর পশ্চিমে বঙ্কুবিহারী মণ্ডল ও আনন্দপ্রসাদ মণ্ডল; মুসলমান আসনে মুসলিম লীগের আবুল হাসেম ও জমিদার আসনে উদয়চাঁদ মহতাব। আবুল হাশিম প্রথম লীগ নেতা যিনি উদারতাবাদ, মার্কসবাদ এবং ইসলামী দর্শনকে প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁর দলকে আভিজাত্যের মোহ থেকে মুক্ত করে করে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'ইমপ্রেশন্যাবল' যুগের যুবকদের মার্কসবাদের প্রতি প্রবল আকর্ষন আছে, তাই আমি ইসলামের সামাজিক-আর্থিক মৌলবাদগুলি বিস্তৃতভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলাম।[22] সেদিন তাঁর কাছে এর অর্থ ছিল ইসলামের আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যা মার্কসবাদের অনুরূপ, কাজেই যুবকরা মার্কসবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হবে। এতদসত্ত্বেও বলতে হয় কমিউনিজম এবং বাংলার হিনুদের প্রতি আবুল হাশিমের দুর্বলতা ছিল। একজন লীগ নেতা হিসাবে তিনি স্বীকার করতেন যেখানে কমিউনিজম মানার মানব আর যেখানে বিরোধিতা করার দরকার সেখানে বিরোধিতা করব।[23] তিনি আরও বলেছেন, 'My catholic approach to politics was constructed by khwaja Nazimuddin and his group as my weakness for the Connunist and tha Hindus'.[24]

১৯৪৫ সালের পর থেকে আবুল হাশিম খাজা নাজিমউদ্দিন ও তাঁর সম্প্রদায়ের সুস্পষ্ট মতিগতি বুঝতে পেরে কমিউনিস্টদের সাথে সমঝোতা করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্ট ও লীগের মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা করতে তিনি আগ্রহী ছিলেন; কার্যত তা হয়ে ওঠেনি। হাশিমের নির্বাচনী মেনিফেস্টো (১৯৪৬) রচনায় কমিউনিস্ট নিখিল চক্রবর্তী প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন।[25] বলাবাহুল্য, ডানপন্থী লীগ নেতারা মেনিফেস্টো কথাটি কমিউনিস্ট 'টার্ম' বলে হাশিমকে আক্রমণ করেন। এই নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার আভাস লক্ষ করা যায়। নির্বাচনের আগে তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশী মুসলিম লীগকে জনগণের আস্থাভিত্তিক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠন রূপে গড়ে তুলতে আহ্বান জানালে হাশিম সরাসরি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[26] স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ বঙ্গভূমি গঠনের আন্দোলনের সময় কমিউনিস্টদের সাথে হাশিমের আন্দোলন প্রায় সমান্তরাল হয়ে পড়ে। তিনি বর্ধমান জেলার কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের সাথে মিলিত হয়ে 'খাদ্য কমিটি' এবং 'বন্যাত্রান কমিটির' সম্পাদক মনোনীত হয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলন করতে থাকেন।[27] বিশেষ করে কমিউনিস্টদের সাথে হাশিমের এই হৃদ্যতা সরকার তথা ডানপন্থী লীগ নেতারা ভাল চোখে দেখেনি। তাঁরা প্রকাশ্যভাবে নানা মন্তব্য শুরু করেন হাশিমকে নিয়ে। দৈনিক আজাদ পত্রিকায় মৌলানা আকরম খাঁ 'হাশিম' নিবন্ধে তাঁকে 'কমিউনিস্ট' ও 'কাদিয়ানী' বলে চিহ্নিত করেন। লীগনেতা আবদুর সবুর খাঁন হাশিমের সঙ্গে কমিউনিস্টদের গোপন যোগাযোগ এবং হাশিমের বিপ্লবীকরণের প্রচেষ্টার কথা ব্যক্ত করেন। খাজা নাজিমউদ্দিনের বক্তব্য ছিল ইসলামের মোড়কে হাশিম কমিউনিজম প্রচার করে বাংলা ক্ষেপান।[28] এইভাবে হাশিমের বিরুদ্ধে নানা ফতোয়া শুরু হয়ে যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে আবুল হাশিম এবং তাঁর থেকে আট বছরের ছোট ভাগ্নে সৈয়দ শাহেদুল্লাহ (বর্ধমান জেলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা সম্পাদক, ১৯৩৫ সাল) বর্ধমানের একই বাড়িতে থাকতেন।[29]

আইন সভায় কোন দলই সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় নাই। আইনসভার মোট আসন ২৫০, এর মধ্যে মুসলিম লীগ ১১৩, ফজলুল হকের Bengal National Muslim Parliamentary Party ৭৮টি আসনে লড়ে পেল ৫টি, তার মধ্যে হক

সাহেব স্বয়ং দুটিতে জেতেন, কংগ্রেস পেল ৮৬, সিপিআই ৩, হিন্দু মহাসভা ১, স্বতন্ত্র মুসলমান ১, স্বতন্ত্র হিন্দু ১৩ ও বাকী অন্যান্য । সুরাবর্দী কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চাইলে, হাইকম্যান্ড আপত্তি জানান। ফলে সুরাবদী উগ্র সাম্প্রদায়িক শিবিরে যোগ দেন। তিনি নবলব্ধ পৃষ্ঠপোষক জিন্নার ডাকে সাড়া দিয়ে কলকাতায় সাল্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করেছিলেন। ১৬ই আগষ্ট সুরাবর্দী যে দৈত্য কলকাতার বুকে ছেড়ে দিলেন জিন্না বা সুরাবর্দী কারও পক্ষে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হল না। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, বিনয় বসু ও কংগ্রেসের আবদুস সাত্তার, যাদব পাঁজা, বিজয় ভট্টাচার্য সকলে একযোগে বর্ধমান শহর ও জেলার অন্যান্য স্থানে ঘুরে পরিস্থিতি শান্ত রাখলেন। কিন্তু যে সব গ্রামে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে কিন্তু গোপনে মসজিদে, লীগের মাতব্বরদের নেতারা বাইরে থেকে এসে নানা ভাবে উত্তেজনা ছড়াবার চেষ্টা যে করেননি তা নয়। ভাতার থানার হরিবাটী, ঘোলদা, মোহনপুর, আউসগ্রাম থানার কয়রাপুর, ভোঁতা, সদর থানার সিমডাল, আলমপুর। এছাড়াও, এড়্যাচা, খারজুলি, খুর্তুবা, বড়দীঘি, ক্ষেতিয়া, কাশেমনগর, চক্ষনজাদী, শেখপুর, বিজুর, মঙ্গলকোট প্রভৃতি অনেক গ্রামের সংবাদ সংগ্রহ করে দেখেছিলাম লীগের কিছু মাতব্বরদের নিয়ে গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করেছিল। ফলে গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা ছিল। আবার কোথাও কোথাও গুজবকে কেন্দ্র করেও দাঙ্গা বাধাবার উপক্রম হয়েছিল। ভাতার থানার হরিবাটী গ্রামে ঠিক এই রকম অবস্থা দাঁড়ায়। সৌচালিদা, বিঘড়া, নারায়ণপুর থেকে হিন্দুর দল ঘোলদার মুসলমান পাড়া জ্বালিয়ে হরিবাটা-র দিকে আসছে এর পর মোহনপুর ও কয়রাপুর আক্রমণ করবে। হরিবাটা গ্রামে তখন মাত্র ঘর চল্লিশেক মুসলমানের বাস। তারা সব ঘরবাড়ী ছেড়ে ধানক্ষেতে আশ্রয় নিয়েছে। পরে মুসলমান পাড়ার নেতা ভূলন মুন্সী, আকবর ওস্তাদ, ভবানী রায়, সুধীর চক্রবর্তী, পশুপতি সেন সবে মিলে শান্তি কমিটি গঠন করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। ফলে আর কোন অঘটন ঘটে নাই।[30]

আমার মনে হয় দাঙ্গার উষ্কানি দেয় কিছু রাজনৈতিক নেতা, নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য, আর তাদের হাতিয়ার হয় কিছু সমাজবিরোধী, কিছু কিছু দরিদ্র যাদের হারাবার কিছু নেই আর কিছু নারীলোলুপ পশু-এরা কিছু লুটপাট করে, নারীহরণ করে নিজেদের আখের গোছাবার চেষ্টা করে। আর এই ফ্রাঙ্কেস্টাইন-এর দৈত্য ছেড়ে দিলে আর তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। হিংসা-প্রতিহিংসার আগুনে সব পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কাজেই কলকাতাতে যেটা সম্ভব হয়েছিল বর্ধমান জেলার মফস্বল শহরে বা পল্লীগ্রামে সেটা সম্ভব হয় নাই। তাছাড়া পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা ছিল সংখ্যা লঘিষ্ঠ, তবে হিন্দুদের মধ্যে অনেকের জোত জমা বেশী ছিল। কাজেই সেখানকার মুসলমানদের যাদেব বেশীর ভাগই দরিদ্র ও হিন্দু জোতদারদের দ্বারা উৎপীড়িত তাদেরকে বোঝান হযেছিল হিন্দুদের তাড়াতে পারলে তাদের সম্পত্তি সবই তারা ভাগ করে নিতে পারবে। কিন্তু এখানে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী, তাদেরকে তাড়াবার কোন প্রশ্নই ছিল না। তাছাড়া দাঙ্গা বাধায় নেতারা; সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ এ সবের কোন ধার ধারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে
*** *** ***

রাজছত্র ভেঙ্গে পড়ে,
রণ ডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি
ওরা কাজ করে...

আর এ জেলার সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ সকলেই প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী শান্তিকামী। মুসলিম লীগের কিছু নেতা অবশ্য উগ্রপন্থী ছিলেন কিন্তু তাঁদের সংখ্যা জেলায় খুবই কম। প্রভাবও বিশেষ ছিল না। কারণ আবুল হাশিমের মত মুসলিম লীগের নেতার কখনই বিচ্ছিন্নতাবাদী রজনীতিকে প্রশয় দেন নি। আবুল কাশেমের একমাত্র পুত্র আবুল হাশিম তাঁর পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল অথচ বিতর্কিত রাজনীতিবিদ। তিনি পূর্বাপর পুরুষানুক্রমিক আধা-সমাজসেবা, আধা-রাজনীতির চরিত্র থেকে বেরিয়ে এসে পুরোপুরি রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন।[31] আবুল হাশিম শুধু তাত্ত্বিক নেতারূপেই নয়, প্রগতিশীল রূপান্তরকামী সাংগঠনিক মনোভাব নিয়ে বাংলার রাজনীতির অঙ্গনে হাজির হয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে পিতা আবুল কাশেম মারা গেলে বর্ধমানের বর্ধমানের সংরক্ষিত আসনে আবুল হাশিম নির্দল প্রার্থী রূপে কংগ্রেস প্রার্থী বর্ধমান জেলার তদানীন্তন কংগ্রেস দলের প্রভাবশালী নেতা মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিনকে ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন।[32] আবুল হাশিম, অবশ্য, তাঁর এই জয়লাভকে তাঁর পিতার জনপ্রিয়তার এবং মৃত্যুর আবেগজনিত কারণের ফল বলে উল্লেখ করেছেন।[33] ১৯৩৭ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নার ব্যক্তিগত আহ্বানে তিনি লীগে যোগদান করেন।[34] ১৯৪১ সালে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সংগঠনে তিনি লীগের কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। নানা টানপোড়েনের মধ্যে তাঁর এই জয়কে তিনি 'miracle' বলে উল্লেখ করেছেন।[35] কাজেই এ জেলায় জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-দিবসের ডাক বিশেষ কার্যকরী হয় নাই।

বাংলার লীগ রাজনীতির নানা পর্যায়ে আবুল হাশিম একদিকে যেমন বলিষ্ঠ জনমত এবং সংগঠন গড়ে তোলেন তেমনি অপরদিকে দলীয় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। আবুল হাশিম সারা বাংলা মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই লীগের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটাতে প্রয়াসী হন। মার্কসবাদী এবং ইসলামিক নীতির সমন্বয় ঘটিয়ে আবুল হাশিম লীগকে ক্যাডার ভিত্তিক সংগঠনে পরিণত করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধক্লিষ্ট এবং দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত যুব সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করে তিনিই সর্বপ্রথম জেলা ও গ্রামভিত্তিক লীগের সংগঠন গড়ে তুলতে তৎপর হন। সারাক্ষণের লীগ সদস্যদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লীগের তহবিল গঠনে সার্বিক চাঁদা স্থিরীকৃত হয়।[36] এর আগে লীগ ব্যক্তিগত দান ও অনিয়মিত চাঁদার উপর নির্ভরশীল ছিল।[37] এককথায় তিনি লীগকে খাজা-নবাব-বাহাদুরদের মঞ্জিল-মহফিল থেকে মুক্ত করে সারা বাংলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হবার (৮ই নভেম্বর ১৯৪৩ সাল) পরদিনই তিনি বলেন, 'মুসলিম লীগ তিন স্থানে বন্ধক রয়েছে, স্যর সলিমুল্লার সময় থেকে নেতৃত্ব বন্ধক আছে আহসান মঞ্জিলে, প্রচার বন্ধক আছে দৈনিক আজাদের মালিকের কাছে আর আর্থিক ভাবে বন্ধক রয়েছে ইসপাহানীর নিকট। আমি চেষ্টা করব ঐ বন্ধকসমূহ থেকে মুসলিম লীগকে মুক্ত করতে এবং বাংলার মধ্যবিত্ত কে তার যোগ্যস্থানে বসাতে।'[38] তিনি অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন। তাঁর কাছে

মুসলিম লীগ মানেই শুধু মুসলিমদের সংগঠন নয়, এটা ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও আত্মপ্রত্যয়ের দাবী সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান।[39] আবুল হাশিমের সংগঠন কৌশল, লীগ ইস্তাহার, সামাজিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর প্রগতিশীল ধারা তাঁর ঘনিষ্ঠতা তাঁকে যেমন মূল লীগের স্রোত থেকে সরিয়ে দিচ্ছিল, ঠিক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া রূপে তিনি বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে উদ্‌বুদ্ধ করে প্রবল জনমত ও সমর্থনের সাহায্যে বিরুদ্ধ বাদীদের কোণঠাসা করেছিলেন।

---

[1] Chandra Bipan, History of Modern India, New Delhi, 2015, p.-321.
[2] মল্লিক সমর কুমার, আধুনিক ভারতের রূপান্তর রাজ থেকে স্বরাজ (১৮৫৮ – ১৯৪৭), কলিকাতা, ২০০৪-২০০৫, পৃঃ-৬৪৪।
[3] Chatterjee Bhaskar and Ramakanta Chakrabarty, Freedom Movement in Burdwan, Burdwan, 1985, p.-35.
[4] তদেব, পৃঃ-৩৬।
[5] চট্টোপাধ্যায় এককড়ি, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড, কোলকাতা, ২০০০, পৃঃ- ৪৫৫।
[6] Chatterjee Bhaskar and Ramakanta Chakrabarty, প্রাগুক্ত।
[7] চট্টোপাধ্যায় এককড়ি, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৪৫৫।
[8] চট্টোপাধ্যায় এককড়ি, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ;-৪৫৬।
[9] দাস দীপক কুমার, কালনার ইতিবৃত্ত, কালনা, ১৯৯৫, পৃঃ-৭২-৭৩।
[10] রহমান এম. আব্দুর, সাত্তার স্মৃতি-কথা, বর্ধমান, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ-৪৭।
[11] (ED) Roy Chowdhury, Ladli Mohan, Quit India Movement 1942, Government of West Bengal, Calcutta, 1992, p.-39.
[12] পাল কানাইলাল, ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও কালনার ভূমিকা, Quit India Movement, Golden Jubilee, Neheru Yuva Kendra, Burdwan, West Bengal, 1992.
[13] ঘোষ সুফলচন্দ্র, বর্ধমান জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্মেলন ও নৃপেন্দ্র স্মৃতি অর্পণ, নৃপেন্দ্র স্মৃতি সংখ্যা, প্রাগুক্ত।
[14] 'গণশক্তি', ২৩শে অক্টেবর ১৯৯৭।
[15] শাহেদুল্লাহ সৈয়দ, বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ, বর্ধমান, ২০১৫, পৃঃ-১০৬।
[16] চট্টোপাধ্যায় এককড়ি, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৪৫৮।
[17] তদেব, পৃঃ-৪৫৯।
[18] চট্টোপাধ্যায় এককড়ি, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৪৫৯।
[19] শাহেদুল্লাহ সৈয়দ, বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৯৪-৯৮।
[20] চট্টোপাধ্যায় এককড়ি, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৪60।
[21] বন্দ্যোপাধ্যায় শেখর, পলাশি থেকে পার্টিশন আধুনিক ভারতের ইতিহাস (অনুবাদ-রায় কৃষ্ণেন্দু) হায়দ্রাবাদ, ২০০৭, পৃঃ-৫২৮।
[22] Hashim Abul, In Retrospection, Dacca, 1974, p.-63.
[23] Ibid., p.-54.
[24] Ibid., p.-78.
[25] দে অমলেন্দু, মুসলিম লীগ রাজনীতি, পৃঃ- ৫৪ (ইতিহাস অনুসন্ধান ৫; পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ১৯৯০)
[26] Hashim Abul, op cit., p.-40.
[27] সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১১০, ১৩২, ১৩৭।
[28] Hashim Abul, op cit., p.-45.
[29] বর্ধমানের ২ নং পারকাস রোডের বাড়িতে এঁরা থাকতেন। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ- এর রচনা থেকে জানা যায় এই বাড়িটি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজনৈতিক আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছিল।
[30] শাহেদুল্লাহ সৈয়দ, বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ, বর্ধমান, ২০১৫, পৃ;-৯১।
[31] রহমান কাজী সুফিউর, মুসলিম মানস সমাজ রাজনীতি আন্দোলন (১৯০৫-১৯৪৭), কলকাতা, ২০১৫, পৃঃ- ৬০।
[32] তদেব।
[33] Hashim Abul, In Retrospection, Dacca, 1974, p.-16.
[34] Ibid., p.-18.
[35] Ibid., p.-34.
[36] Ibid., p.-36.
[37] ইতিপূর্বে লীগের হিসাবরক্ষক ছিল বটে তবে কোন খাজাঞ্চীখানা ছিল না। প্রয়োজন মতো চাঁদা সংগ্রহ করে লীগের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। হাশিম সম্পাদক নির্বাচিত হবার পর নির্দিষ্ট চাঁদার হার নির্ধারন করেন; অর্থাৎ তিনি লীগকে খাজাদের দরবারে থেকে সাধারণ মানুষের পার্টিতে পরিণত করার চেষ্টা করেন।
[38] Hashim Abul, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৩৫।
[39] Hashim Abul, op cit., p.-37.